



মাসিক পত্রিকা

চতুর্বিংশতি বর্ষ

১৮৩-১৪০১



আজ

বর্তমান

সম্পাদিকা - রেখা চট্টোপাধ্যায়

# চুড়ীসুত্র

|                                                         |     |    |
|---------------------------------------------------------|-----|----|
| 'কে গো তুমি হায় এলে গো ধরায়' ( কবিতা )—সুনীল কুমার দে | ... | ১  |
| খনিগর্ভে ( কবিতা )—শতদল                                 | ... | ২  |
| কবি গোপাল ভৌমিক ( প্রবন্ধ )—শ্রীসত্যসেবক স্বরসতী        | ... | ৩  |
| গলগ্রহ ( গল্প )—আদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায়                  | ... | ৯  |
| স্মরণীয় পালনা—ব্রীণা ভট্টাচার্য                        | ... | ১৪ |
| ফুল ( কবিতা )—কুমার রঞ্জন                               | ... | ১৮ |
| চিঠিপত্র                                                | ... | ১৯ |
| সম্পাদিকার কথা—                                         | ... | ২০ |

সম্পাদিকা : রেখা চট্টোপাধ্যায়

সহযোগী সম্পাদক : ডাঃ গোবিন্দ দাস চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রণ : কৃষ্ণা আর্ট প্রেস

প্রচার সম্পাদক : জ্যোতির্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাপ্তিস্থান : আভা কার্যালয় - ৭৩সি, শরৎ বসু রোড, কলিকাতা-৭০০০১৬। ফোন : ৪৭৫-৮১৭২

মূল্য—১.৫০ টাকা

## বিজ্ঞপ্তি

গ্রাহকগণের প্রতি :

যে সকল গ্রাহকগণের বার্ষিক টাঁদা বাকি পড়েছে তাঁদের বাকি টাঁদার জন্য এই সংখ্যার সহিত একটি স্লিপ দেওয়া হইয়াছে। গ্রাহকগণকে অনুরোধ করা হচ্ছে তাঁহারা যেন বাকি টাঁদা শীঘ্রই পাঠিয়ে দেন। যদি গ্রাহক থাকতে অনিচ্ছুক হন, তাহলে আমাদের জ্ঞানালে বাধিত হবো। আর পত্রিকা পাঠান হবে না।

সম্পাদিকা—

চতুবিংশতি বর্ষ

প্রথম সংখ্যা



বৈশাখ ১৪০১

March 1995

তমসো মা জ্যোতির্গময়ম

## ‘কে গো তুমি হায় এলে গো ধরায়’

সুনীল কুমার দে

কেগো তুমি হায়

এলে গো ধরায়,

ব্রাহ্মকৃষ্ণ রূপ ধরে ।

ক্ষুদিরাম ঘরে,

চন্দ্রামণির কোলে

কে এলে আলো করে ॥

গয়াধামে ক্ষুদিরামে বলেছিলে

পুত্র হয়ে যাব বলে,

গদাধর রূপে কে গো এলে,

প্রেমভক্তি বিলাবার তরে ।

যুগীদের মন্দিরে সন্ধ্যা বেলায়

কে গো তুমি এলে আলোক মালায়

চন্দ্রামণির উদরে প্রবেশিলে হায়

কে এলে জ্যোতির আকারে ॥

মা মা বলে কত কাঁদিলে

পাষানী মাকে তুমি জাগালে

নিজে খেয়ে এঁঠো মাকে খাওয়ালে

পাগল ঠাকুর হয়ে ॥

কেহ বলে তুমি রাম তুমি কৃষ্ণ

কেহ বলে বুদ্ধ খৃষ্ট শ্রীচৈতন্য,

কেহ বলে তুমি শক্তি তুমি ব্রহ্ম

সবই তুমি একাধারে ।

## ॥ খতিগর্ভে ॥

শতদল

তলহীন ঘন-অন্ধকার এই বিশ্ব-খনির গর্ভে  
 কখন এস্তু কখন হিংস্র দ্বিপদের আনাগোনা...  
 এদেরই নাম কি মানুষ? যাদের সভ্যতার বড়াই?  
 এস্তুরা যেন গ্যাস-চেষ্টারে বাঁচার শেষ প্রয়াস—  
 হিমেল মৃত্যু এনে দিয়ে সেথা হিংস্রের উল্লাস!  
 বর্বরতায় নাংসী হওয়ায় যাদের তুলনা নাই?  
 অন্ধকারেই স্বাপদের মত এদের আক্রমণ  
 এরা মনে হয় কখনই যেন ছিল না জালোর জীব  
 পিশাচের মত ভয়াল করাল ক্রুরতায় বিভীষণ  
 গোপন পাতালে প্রতাপে আসীন যেন আদিকাল হতে  
 শয়তানও বুঝি লজ্জায় মরে এদের শয়তানিতে!  
 যদি বল শিব গড়বার ছিল, বাঁদর হয়েছে ভুলে  
 তবে বিধাতারে মর্কটদল তখনি চড়াবে শূলে—  
 পশুরও অধমই নয় শুধু এরা পরা-দানবীয় চক্র  
 হিংসার বিষে ডাকিনী অংশে সগরের সম্তান  
 সব মঙ্গল অনায়াসে এরা দিয়েছে জলাঞ্জলি  
 নরকের পৃতিগন্ধে ভরিছে ধরার বাতাস-ধূলি।  
 মায়ের নামের সেফ্‌টিল্যাম্পটি নিয়ে এসো নেমে যাই  
 ওদের মাঝারে যেখানে বুঝিবা নিশ্চতনার ঠাঁই—  
 বিজাতীয় কোন শত্রুই ভেবে ওদের ছুঁছকার  
 সবলে ঝাঁপিয়ে পড়লেও ভয় চলবেই নাকো পাওয়া।  
 আলোকের ছোঁয়া পেয়ে ওদেরই যে মিলিয়ে যেতেই হবে  
 সেই ভরসায় সেই বিশ্বাসে রক্ষাবর্ম করে  
 এসো চলে যাই এই জগতের তামসের বুক চিরে :  
 শান্তি স্বস্তি আনন্দ আর প্রসন্ন সাম গান...  
 খনির কালোয় জাগিয়ে তুলুক হীরক দীপ্ত প্রাণ !

## ॥ কবি গোপাল ভৌমিক ॥

### খ্রীসতাব্দেবক স্বরসতী

ইদানীংকালে প্রায়শঃ চোখে পড়ে—কাব্য আলোচনার ক্ষেত্রে কবিকে দশকের পরিমণ্ডলে বিচার করা হয়। এই বিচারে স্বভাবতঃই মনে হয়—সাম্প্রতিককালে কোনো কবিই বিশেষ কোনো দশকের উর্ধ্বে সর্বকালীন সৃষ্টির পরিচয় দিতে সক্ষম নন। যদি সক্ষম হন, তবে তাঁকে কোনো বিশেষ দশকের ছকে ফেলে বিচার করা কেন? আমার ধারণা—যে-কোনো কবির মনের মুকুরে যেমন সমকালীন বিষয়বস্তু অধিক মাত্রায় প্রতিফলিত, তেমনি একটি সর্বকালীন আবেদনেও তাঁর মন সমভাবেই সাড়াপ্রবণ। তাঁরা সেকালকে-একালের সঙ্গে মিলিয়ে অবিচ্ছিন্ন জাতীয়তাবাদ ও সাংস্কৃতিক চেতনার এক দৃঢ় বলিষ্ঠ সেতু রচনা করার প্রয়াসী। তাঁদের শক্তি সীমিত হলেও মানসিক প্রেরণা প্রবল, যেমন—

কে তুমি চিহ্নিত ক'রে দিতে চাও সীমা  
পাঁচ দশ বৎসর বা ততোধিক সময়ের  
রেখা টেনে টেনে  
কিন্মা এঁকে যে-কোনো দ্রাঘিমা  
কে তুমি বোঝাতে চাও  
অনাদি এ কালের মহিমা ?...

এ প্রশ্ন আজকের যুগ-সচেতন কবি-মনেরই প্রশ্ন। তাঁকে দশকের বেড়াজালে চিহ্নিত ক'রে রাখার নয়। অনাদিকালের অনন্ত মহিমায় যে মন আচ্ছন্ন, সে যে 'সীতার গতি' ছেড়ে প্রধাবিত 'স্বর্ণমুগে'র সন্ধানী!

একালের এ জাতীয় প্রাণবান কবিদের একজন গোপাল ভৌমিক।

যে-মন পুষ্পবিতানের মতো পৃথিবীর যাবতীয় সৌন্দর্যকে নিজের নথ্যে আকর্ষণ করতে পারতো, যে-মন শুভের দ্বারা শুভকে জাগাতে পারতো, যুগযন্ত্রণার কঠিন দাবদাহে সেই মন কবেই সেই পুষ্পিত আশাবৃক্ষ থেকে স্থলিত হয়ে শুকিয়ে গেছে। নিজের কাছে নিজেকে তাই বড় পরিহাস বলে মনে হয়, নিজেকে ভালোবেসেও মনে হয়—এ ভালোবাসায় চমক আছে, কিন্তু আনন্দ নেই। সাম্প্রতিক কালের নৈরাজ্য ও মূল্যহীন জীবনবোধের পরিবেশে একথা বোধ করি সকলেরই কথা এবং বিশেষ ক'রে কবির কথা তো বটেই! কারণ তাঁর স্পর্শকাতর মন তাঁর সমসাময়িক যুগকে স্পর্শ ক'রেই উরসিত, উৎক্ষিপ্ত বা অভিভূত হয়ে থাকে। এ জাতীয় ভাবনার এক অন্তত সার্থক প্রকাশ লক্ষ্য করি শ্রীভৌমিকের কাব্যে। 'পৃথিবীকে ভালোবাসি' কবিতায় তিনি অকপটে মনের এই দ্বৈত ভাবনাকে রূপ দিয়ে বলেছেন—

পৃথিবীকে ভালোবাসি,  
তবু তার মর্মকোষে প্রবেশের অধিকার  
বহুদিন ফেলেছি হারায়ে :  
তাই তো কবিতা গান  
যা কিছুই লিখি, ছবি আঁকি—  
ওঠে না তা নিজেকে ছাড়ায়ে ।  
লাঙলের ফলা দিয়ে  
দীর্ঘে দীর্ঘে মাঠে ছবি এঁকে  
ফসল তোলার দিন হয়ে গেছে শেষ :  
ট্রাক্টরের সূচীমুখে  
মৃত্তিকার বুক চিরে  
ফসল মড়াই ভরে ভাবি আছি বেশ ।  
অথচ থাকি না ভালো,  
জীবনের সব কিছু এক হাঁচে ঢালা,  
প্রায় মৃত অনুভূতি আশা :  
তাইতো কবিতা গান  
যা কিছুই লিখি, ছবি আঁকি—  
হয়তো চমক আনে, মেটায় না প্রাণের পিপাসা ।

পরানীন ভারতের কুটিল কুস্কটিকায় যেখানে মস্ত বড় একটা পাপ বাসা বেঁধে ছিল,  
আর সেই বাসাকে ভেঙে দেবার অকুণ্ঠ প্রয়াসে জেগে উঠেছিল মুক্তি-আন্দোলন, তখন তিমির  
বিদারি আলোকোচ্ছল প্রভাতের আভাস জাগে কবির লেখনীতে—

দুঃসাহসে বাঁধো বুক—  
শান দাও লগ্ন তলোয়ার,  
যখন সূর্য্য আসে—  
ছিঁড়ে ফেলো পুঞ্জিত আধার ।

এই উদ্দীপিত আশার পাশাপাশি নিজের জীবন চিত্রের প্রতি লক্ষ্য ক'রে কবির মনে  
অলক্ষ্যেই আবার প্রশ্ন জাগে—

আমার পৃথিবী কেন সীমাবদ্ধ  
বল হে ঈশ্বর ?

মুক্তিস্বাদ পাবো না কি, পাবো না কি  
ঐশ্বৰ্যের বর ?

কিন্তু আত্ম-চড়তাকে কাটিয়ে উঠতে সময় লাগে না কবির, বলেন—  
ভীকু রক্তে নামে আজ বিপ্লবের নেশা :  
বুদ্ধিজীবী মন নিয়ে এ আত্ম বিলাস  
আর নয়—  
আর নয় শান্তির কুয়াশা ।

আর তখনই—

প্রদীপ্ত দিনের ডাকে  
সাড়া দিই আনন্দিত মনে,  
দেখি লাল সূর্য ফলে  
প্রতি পর্ণ-কুটিরের কোণে ।

অন্ধকারকে জয় ক'রে নব আলোক সঞ্চারের ব্যাকুলতা এবং নিজের 'শিল্পপ্রাণতা' দিয়ে  
অপরের মধ্যে-শিল্পজাগৃতি—কবিমাত্রেরই সৃষ্টিকর্মের এই তো মূল প্রেরণা ও উদ্দেশ্য । সেই উদ্দেশ্য  
সাধন করতে গিয়ে কোন্ কবি কতখানি বেগবান ও প্রকাশমান এবং তাঁর 'কারুকৃতি ও ব্যঙ্গনা  
কতখানি যুগোপযোগি, রসসঞ্চারী, তাই দিয়েই প্রধানতঃ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ও অনুভূতি বিচার্য ।  
বলতে বাধা নেই যে, সে-বিচারে ত্রীভৌমিক পাসের এগ্রিগেট ছাড়িয়ে আরও অনেক বেশী নম্বর  
পান । তিনি আধুনিক হয়েও আধুনিকতার ছটলতা ও কুস্মটিকা থেকে মুক্ত । ভাবা ও প্রকাশ-  
ভঙ্গী তাঁর চিরকালই অত্যন্ত সহজ ও সরল । ফলে তাঁর বক্তব্যের গভীরে প্রবেশ করতে একটি  
সাধারণ জ্ঞানের মানুষকেও কষ্ট পেতে হয় না ।

সাহিত্যের এট একটি মহৎ গুণ । আমাদের মহাকাব্যগুলি যে আপামর জনসাধারণের  
অন্তরে অতি সহজে প্রবেশ করতে পেরেছিল, তার প্রথম কারণই হলো তাদের অনাড়ম্বর সহজ  
সরল ভাষা । কিন্তু বাংলা ভাষার বৈজ্ঞানিক প্রসারের ফলে আধুনিক কালে অনেক কবির মতোই  
ভাষা ও প্রকাশ ব্যঙ্গনাকে যতদূর সম্ভব কুয়াশাচ্ছন্ন ও গুরুচালি শব্দসঙ্কুল ক'রে তোলার প্রবণতা  
প্রায়শঃই লক্ষ্য করা যায় । পাঠক থেকে তাদের বিচ্ছিন্নতার এটাও একটা অন্ততম কারণ ।  
ত্রীভৌমিকের শব্দ প্রয়োগ নৈপুণ্য ও প্রকাশভঙ্গী এদিক থেকে অতি সাধারণ মানুষেরও মনোগ্রাহী ।  
কিন্তু একথা বলবো না যে, কাব্য সৃষ্টিতে তিনি আমাদের কোনো মহত্তর জীবনের স্পর্শ এনে  
দিতে পেরেছেন, অথবা তাঁর নব নব সৃষ্টির স্বাক্ষর মনকে আমাদের নিত্য দোলায় নৃত্যচঞ্চল  
ক'রে তুলেছে, তবু একথাও অস্বীকার করবো না যে, প্রায় পাঁচ দশকের অধিককাল ধরে নানা

অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির দ্বারা তিনি যে বিচিত্র সৃষ্টির জালে আমাদের মনকে সময় থেকে সময়ান্তরে ছড়িয়ে রেখেছেন, তার মাধুর্য ও মূল্য অনেকখানি। এ পর্যন্ত তাঁর প্রকাশিত তিনটি কাব্যগ্রন্থ—‘স্বাক্ষর’ ( ১৯৪৪ ), ‘বসন্ত বাহার’ ( ১৯৬২ ), এবং ‘সময় সম্পৃক্ত’ ( ১৯৭৪ ) র সঙ্গে আমাদের পরিচয়। এর বাইরে তাঁর অজস্র কবিতা নানা পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। তাঁর কাব্য সৃষ্টির সামগ্রিকতার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কোনো সমসাময়িক ইতিহাসের দিক থেকেই তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে থাকেন নি! তা কখনো সূক্ষ্মভাবে কখনো বা বিস্তৃতাকারে কাব্য রূপ পেয়েছে। শ্রীভৌমিকের যদি সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে হয়, তবে নিঃসন্দেহে বলতে হবে—তিনি মূলতঃ ছুঃখবাদী কবি। জীবনকে গভীরভাবে অনুভব করাই এই শ্রেণীর কবিদের প্রধানতম লক্ষণ। ছুঃখবাদ এখানে জীবনবাদেরই ভিন্ন নাম। তাই তিনি যা কিছু রচনা করেন, তা মূলতঃ জীবনধর্মী হয়ে ওঠে। অথচ তার প্রকাশ অত্যন্ত প্রাঞ্জল। এক্ষেত্রে যদি তাঁর কেউ পূর্বসূরী থেকে থাকেন, তবে নিঃসন্দেহে তিনি প্রমথ চৌধুরী ( বীরবল )। কিন্তু শ্রীভৌমিকের কাব্যে বীরবলী তির্যক ও ব্যঙ্গের দিকটি পুরোমাত্রায় অনুপস্থিত। সহজ কথাকে সোজাভাবে বলতে পারার ক্ষমতা চাই। সে ক্ষমতা বীরবলের যেমন, শ্রীভৌমিকেরও তেমনি। যেমন মৌলিক কাব্য সৃষ্টিতে, তেমনি অনুবাদ ও ইংরেজি কাব্য রচনায়ও তিনি সমান দক্ষ। তাঁর বহু ইংরেজি কবিতা যেমন আমাদের চমকিত করে, তেমনি কাজি নজরুলের ‘দারিদ্র্য’ প্রভৃতি দীর্ঘ কবিতার প্রাঞ্জল ইংরেজি অনুবাদ এই কবির অসাধারণ শক্তি সম্পর্কে বিশ্বাসাতীতভাবে আমাদের সচেতন ক’রে দেয়! বহু ধারায় প্রবাহিত শিল্পকর্মে তাঁর লেখনী চিরকাল অক্লান্ত থেকেছে।

মূলতঃ কবি হয়েও নিজেকে তিনি একান্তভাবে কাব্যসৃষ্টির মধ্যেই নিমগ্ন রাখতে পারেননি। ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে এম, এ পাশ ক’রে জীবিকা হিসেবে তিনি সাংবাদিকতার প্রতি গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি হেমেন্দ্রনাথ দত্ত—সম্পাদিত মাসিক ‘মাতৃভূমি’ সাহিত্য পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন। কিছুকাল ঘরে বসেও ‘মাসক’ নামে একটি মাসিক সাহিত্যপত্র সম্পাদনা করেন। পরে পর্যায়ক্রমে দৈনিক ‘কৃষক’ ও দৈনিক ‘স্বরাজ’ পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক ও হুগু প্রেস-পরিচালিত দৈনিক ‘কিশোর’ পত্রিকায় সম্পাদক হিসেবে সাংবাদিক জগতে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। সাপ্তাহিক ‘দেশ’ পত্রিকার সাময়িক সংবাদ বিষয়ক নিবন্ধ রচনাতেও কিছুকাল তিনি নিজেকে ব্যাপ্ত রাখেন। পরে পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় শ্রীভৌমিক প্রেস-অফিসার হিসেবে যোগ-দেন ব্রিটিশ ইন্ফর্মেশন সার্ভিসের কলকাতা-অফিসে। পরে কিছুকাল ‘নিউজ রাইটার’ হিসেবে যুক্ত-হোন ইংরেজি ‘people’s weekly’ পত্রিকার সঙ্গে। এরপর Public Service Commission-এর মাধ্যমে তিনি যোগ-দেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগে। প্রথমে Public Relation’s Officer, এবং পরে ঐ বিভাগেরই Director পদে উন্নীত হন। এ সময়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অধিকৃত ‘দৈনিক বঙ্গবতী’ পত্রিকার সম্পাদনা কার্যে বিদগ্ধ উপস্থিত হলে আভা / চৈত্র সংখ্যা—৬

পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন রাজ্যপালের নির্দেশে শ্রীভৌমিক 'দৈনিক বসুমতী'র ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও প্রধান সম্পাদক হন। ফলে তাঁর কর্মকেন্দ্র হয় একই সঙ্গে রাইটাসেস ও বসুমতীতে যুগ্মভাবে। পরে ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকারের মর্জিনতো 'বসুমতী'র সম্পাদনার দায়িত্ব অধরের উপর বর্তায় এবং অত্যন্তকাল পরে তিনি প্রচার ও জনসংযোগের ডিরেক্টর পদ থেকেও অবসর গ্রহণ করেন। এরপর তিনি ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র 'চৌরঙ্গী'র সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি হিসেবে পত্রিকাটির যথেষ্ট গৌরববৃদ্ধি করেন।

তাঁর জন্ম এই ইংরেজি শতাব্দীর প্রথম দশকের শেনাবেরে। তাঁরা ছিলেন অবিভক্ত বাংলার পূর্বাঞ্চলীয় লোক। প্রথম জীবন কাটে উলিপুর, রংপুর প্রভৃতি অঞ্চলে। কলকাতায় এসে তিনি বঙ্গবাসী কলেজ থেকে ইংরেজি অনার্স নিয়ে বি এ পাশ করে ভর্তি হন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিবাহিত জীবনে প্রথম পুত্র সন্তান হতে গিয়ে স্ত্রীবিয়োগ ঘটে। ফলে পুনর্বীর তাঁকে দারপরিগ্রহ করতে হয়। প্রথম পুত্রও জীবিকার্জনের প্রাথমিক পর্বেই এক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায়। পরবর্তীকালে দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভজাত দুই পুত্র ও দুই কন্যা সকলেই কৃতি। পুত্র কন্যাদের উদ্যোগেই শ্রীভৌমিক সঙ্গীক ছ'বার কিছুকাল করে লন্ডন ও আমেরিকায় কাটিয়ে আসেন। এক সময়ে তিনি 'P.E.N'-এরও সেক্রেটারী ছিলেন। রান্নাঘর হিসেবে ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র, অমায়িক, বন্ধু-বৎসল ও সজ্জন-পৃথী। তেমনি তাঁর কর্মনিষ্ঠা ছিল অসাধারণ। লেখক হিসেবে তিনি যে-মহৎ স্রষ্টা ছিলেন, এমন নয়, কিন্তু তাঁর কাব্যপ্রকাশের সহজ সরল ভাষা, প্রবন্ধের বিষয়-বৈচিত্র্য ও অনুবাদের মূল্যবানতা তাঁকে বাংলাসাহিত্যের যে-খ্যাতির আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, তাও বড় কম সম্মানের নয়। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'নেতাজী', 'ক্ষুদিরাম', প্রফুল্ল চাকীর 'জীবনী' (১৯৪৫), 'সমাজ ও সাহিত্য' (১৯৪৪), 'সাহিত্য সমীক্ষা' (১৯৬৫), অনুবাদ গ্রন্থ— 'কয়েকটি অনুবাদ গল্প' (১৯৫০), 'বেদনামৃত' (১৯৬১) ও জ্যাক লন্ডনের গল্প (১৯৬৯) বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত কিছু বিদেশী কবিতা ও সুভাষচন্দ্রের কিছু ইংরেজি রচনার বঙ্গানুবাদেও শ্রীভৌমিক বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।

সমাজ ও সাহিত্য সম্পর্কে নানা মূর্খীর অভিব্যক্তি রয়েছে। সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সাহিত্যের বিবর্তন যেমন অবশ্যস্বাভাবিক। তেমনি বিবর্তিত সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে সাহিত্যের সত্য সম্পর্কিত মনীষী ভাব্য সমূহও আলোচনা সাপেক্ষ। এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীভৌমিক বলেছেন: 'সাহিত্যের বিবর্তন বুঝতে হলে আমাদের সর্বপ্রথম আয়ত্ত করতে হবে সামাজিক বিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়মগুলি।' কারণ—'সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসে মার্ক্সের দার্শনিক-বস্তুতত্ত্ববাদ যে যুগান্তর এনেছে, সে কথা আমরা সবাই জানি। প্রাণীজগতের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে ডারউইনের দান যেমন অপরিণীম, মানব সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাসে মার্ক্সের দানও তেমনি তুলনাহীন। যখন থেকে মানুষের সমাজ সৃষ্টি হয়েছে। তার পর থেকে সমাজে যে ওলট-পালট

ভাঙা-গড়া চলছে, তার বিজ্ঞানসম্মত এত সুন্দর বিশ্লেষণ আর কেউ দিতে পারেনি।' —সামাজিক উৎপত্তি ও বিকাশের ধারার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের বিবর্তন এবং উভয়ের উপর উভয়ের প্রভাব সম্পর্কিত এই আলোচনায় শ্রীভৌমিক যে অনুশীলন-প্রবণতার পরিচয় দিয়েছেন, তা বিদগ্ধ পাঠক-মাত্রের মনেই বুদ্ধিবৃত্তির ঢেউ তুলবে। এ জাতীয় রচনার সামাজিক মূল্য যথেষ্ট। সাহিত্য-বিষয়ক আলোচনামূলক প্রবন্ধ বাদেও শ্রীভৌমিকের লেখনী থেকে আমরা আরও বহু বিষয়ক রচনা লাভ করেছি; তার শ্রেণীবিভাগ করতে গেলে দাঁড়ায়—জীবনীমূলক, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা বিষয়ক, চিত্র-মঞ্চ ও ক্রীড়া-সম্পর্কিত এবং অন্যান্য। জীবনের দীর্ঘকাল সাংবাদিকতা করার ফলে এসব বিষয়ক আলোচনায় স্বাভাবিক লেখনী সঞ্চালন তারপক্ষে অনায়াসলব্ধ হয়েছে, সন্দেহ নেই। যাঁরা তাঁর রচনায় দার্শনিকত্ব আবিষ্কারের চেষ্টা করবেন, তারা হয়তো হতাশ হবেন, কারণ তৎসংগত দার্শনিকতার চাইতে বিষয়গত বস্তুতাত্ত্বিকতার তিনি ছিলেন অধিক পক্ষপাতি। ফলে তাঁর প্রবন্ধ মৌলিক সৃষ্টি না হয়ে প্রধানতঃ আলোচনাধর্মী হয়ে উঠেছে। সাধারণ পাঠকের পক্ষে এটা বৃহত্তর লাভ।

ব্যক্তিগত চরিত্রের দিক থেকে শ্রীভৌমিক যেন ছিলেন খাঁটি আটপোরে বাঙালী, তেমনি ছিলেন পরহিতব্রতী। সবার উপর তিনি ছিলেন একজন একনিষ্ঠ কর্মী। 'কর্মই জীবন': এই মূল সত্যকে গ্রহণ করে তিনি তাঁর জীবনকে অবিচ্ছেদ্য কর্মের মধ্যে সংস্থাপিত করেছিলেন। নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর কোনো অহমিকা ছিল না। সুখ ও দুঃখ তাঁর কাছে প্রায় সমতুল্য ছিল। সর্ব বিষয়কে তিনি তাই যেরকম নৈর্ব্যক্তিক ভাবে ভাবতে পারতেন, অন্যের পক্ষে সাধারণতঃ তা সম্ভব নয়। আমরা অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল তাঁর মধুর সৌহার্দবন্ধনে আবদ্ধ থেকে এক অনন্ত প্রীতির জগতে বাস করেছি। ২০শে জানুয়ারী, ১৯৯৫ তিনি সহসা লোকান্তরিত হওয়ায় আমাদের সেই প্রীতির জগৎ এক করুণ সংরাগে ভরে উঠলো ॥

প্রাকসর ডাঃ জি. সি. মুখার্জী ও ডাঃ (মিঃ) কবীর প্রণীত—

## “ডায়াবিটিসের জীবন ও চিকিৎসা”

( দ্বিতীয় সংস্করণ )

মূল্য—১০ টাকা

ডায়াবিটিস রোগী, নার্স, সেবিকা, প্যারা-মেডিকেল কর্মীদের জন্য সাবলীল সোজা বাংলায় লিখিত।

প্রাপ্তিস্থান—‘আভা’ কার্যালয়, ৭৩সি, শরৎ বসু রোড, কলিকাতা-৭০০ ০২৬

টেলিফোন : ৪৭৫-৮১৭২

## ‘গলগ্রহ’

আদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায়

গলগ্রহ !

কাঙালের মা বিছানায় শুয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে আর ভাবে এ যেন পায়ের কঁাস গলায় তোলা হয়েছে। এতদিন ভালপাতার চাটাইয়ে শুয়ে ছেঁড়া কাঁথা মুড়ি দিয়ে পরম নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়েছে। প্রবল শীতে কঁদতে কঁদতে ঘুমিয়েছে, ঘুমোতে ঘুমোতে বেঁপেছে। তার এখন শত্রুর এসে জুটেছে—ঘুম কেড়ে নিয়েছে শীতের বড় বড় রাতগুলো।

ছত্তোরি ছাই !

মরণকালে গায়ে কস্থল চাপিয়ে ছগ্গে যাবে নাকি ? কস্থলখানা পা-থেকে খুটিয়ে রেখে আপন মনে হাসে আর বিড়বিড় করে বকে সে, ‘ক্যানে যে কাঙালের জেদাজেদিতে পঞ্চায়েত অফিসে টিপছাপ দিতে গেলো’ ?

এবার পৌষ মাসে শীত পড়েছে বড্ড বেশী। কদিন থেকে আবার ছিঁচকীতুনে বৃষ্টি আর তার সঙ্গে ঝড়ো হাওয়া ষোগ দিয়ে হাড় কাঁপুনে ঠাণ্ডা জাঁকিয়ে বসেছে। —না আছে রোদের বালাই না পারছে বাচ্চাদের কাছে বসে সকাল বিকেল আগুন পোহাতে। নিরুপায় হয়ে ঘরের কোনটা দখল করে বসে আছে নাতনিকে নিয়ে। —বাচ্চা মেয়ে, কেবল আবদার করে, ‘ঠা’মা গল্প বলো—’ !

মাজা কোমর টনটন করে।

উঠে বসে কাঙালের মা। পা পর্যন্ত চাদর দিয়ে ঢাকে। বড্ড শীত করছে। ওপাশে পাট করে রাখা কস্থলখানা যেন তার দিকে ট্যারা চোখে তাকাচ্ছে। মন বিষিয়ে ওঠে। উঠে গিয়ে ছেঁড়া চাটাই দিয়ে ঢেকে দেয়। —‘কে বুঝবে তার মনের কথা।’

নাক সিঁটকোয় আসানী। —তোমার চাদরটায় বোক্টা বোক্টা গন্ধ—ছিঃ—ছিঃ মাগো কি ছগ্গ, গন্ধ—’

‘দিন-রাত গায়ে চাপিয়ে রাখলে গন্ধ হবে না ? বিছাম আছে ? —হঁ, তোর মাকে কতদিন বলেছি সিজিয়ে দিতে—শুনেই মুখ বেজার—অমন ধকো চাদর কাচবার গতর নাই—শোনো কতা—আর আমি গতরখাকী তো গতরের ‘মাতা’ খেয়ে বসে আছি ! —কি করি বল—’

আতুরে কণ্ঠে আসানী বলে। ‘রাতদিন খেটে খেটে মরে গেলো—মায়ের নিন্দে করচো’ ?

মুহু হাসে ঠা'মা, 'ছুঁড়ির গায়ে নেগেচে—আহা গব্যধারিনী না—' !

বৌমা মুড়ি আর কাঁচা পেঁয়াজ দিয়ে যায় দুজনকে ; 'খাও—'

'কাঁচা নংকা নাই বউমা—' ।

মুহু ধমক দেয় বউমা, 'জানি তো তোমার খাত—খেয়ে আমাশা ধরাও—' !

কান খাড়া করে কাঙালের মা ডাবডাব করে চায়, 'কি বললে ? —নাই ? —এঁ্যা— ?  
—ব্যাভের সদ নাই কিনা তাই—'

গাছ থেকে একটা নংকা তুলে এনে দোর গোড়া থেকে ছুড়ে দেয় বৌমা, খাও—  
আমাকে দুধবে না । —তোমার ব্যাটা যেন তখন মারমূর্তি না করে অনিয়ম অশ্লিলের কতা তুলে !

ঘরের কোনটা আজ যেন কাঙালের মায়ের কাছে স্বর্গের চেয়েও বড় বলে মনে হয় ।  
অবশ্য জীবনে এমন অলসমুহূর্তে এসেচে প্রবল ঠাণ্ডার দৌলতে । কতটা বেলা হলো কে জানে ।  
এদিকে আজ নাকি দ্বাশ জুড়ি 'ধম্মোঘট' ! —তাই ট্যান যাওয়ার শব্দ শোনা যায় না ।  
—পুলের উপর চাপলেই কি আওয়াজ—ঝমঝম—ঝুমুর—ঝুমুর—' ।

ভাঙা জানালার একটা পাল্লা নাই অনেকদিন থেকে । চাটাই গুঁজে ফাঁক বন্ধ করা  
থাকে । হঠাৎ দমকা বাতাসে 'ধপাস্' করে উড়ে পড়লো সেটা ঘরের মেঝেতে ।

আসানী গুঁজতে যায়, 'বাপরে—যা বাওর—( বাতাস ) দিচে না—দাঁত কপাটি লেগে  
যেচে—ও ঠা'মা, হাত দিয়ে ধরো না চাটাইখানা—দড়ি দিয়ে বাঁদি—' ।

ওদের দুজনের জানলা মেরামতের সুযোগে তলগড়ে বসে থাকা বিড়ালটা এসে মুড়ির  
থালায় মুখ দেয় !

হাঁ—হাঁ করে ওঠে কাঙালের না, 'বেড়ো—বেড়ো বলচি—ছু-ছু'বার দেলাম—রাখুসো খিদে  
নিয়ে বসেচে—হুঁ' !

চাটাই বাঁধা শেষ করে, আসানী মাথা নাড়ে, 'আমি আর এ মুড়ি খাবো না ঠা'মা—  
মাকে বলো আলাদা দিতে—' ।

'চং দেকে বাঁচি না—নে খা ! —তিনদিন ধরে ডাওর—ঘরে কি টিনটিন মুড়ি আছে ?  
তাছাড়া মা শুনলেই বকবে ! গুটে—সব মানুষের কি ঘরের দরজা জানালা থাকে—খাবারে  
কুকুর—বিড়াল—ইহুর কত কিসে মুক দেয়—আমি কত খেয়েচি, কিছু হয় নাই ! —তাছাড়া  
মেয়ে মানুষের অত বাচবিচার করতে নাই—জানিস বিড়াল মা-ঘটির বাহন—ঘেরা করলে পাপ দেয় ।'

এবার বৃষ্টি চেপে আসে ।

ঘরের এক কোণায় জল চুঁইয়ে পড়েছে । আসানী একটা মালসা পেতে দেয় । তারপর  
ব্যগ্রকণ্ঠে বলে, 'ঠা'মা তোমার বিচেনা গুটিয়ে রাখো ঐ পাশটায়—ভিজে যাবে !'

বিরক্তি কণ্ঠে কাঙালের মা বলে, 'ওঁ', 'গামাকে তো শুতে হবে রাতে। এরপর ভ্রু কুঁচকে মাজা সোজা করার বুথা চেষ্টায় কুঁজো হয়ে উঠে দাঁড়ায়, "মরণও হয় না—কবে যে, যম নেবে—' ওঁড়ি ওঁড়ি গিয়ে বিছানা সরাতে থাকে সে।

আসানী চোঁচিয়ে ওঠে, 'ঠা'মা, তুমি কন্বলখানা গায়ে জড়াও—বড় কাঁপচো। ইস—'!

ধমকে ওঠে ঠা'মা, 'খ্যে—কন্বল গায়ে দেবার মতো জ্বর নাই! বলেই পিছন ফিরে তাকিয়ে স্নেহাঙ্গুণে বলে, 'তোমাই বরং জান্লা বন্দ করতে গিয়ে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেচে, নে বেস কন্বলখানা গায়ে জড়িয়ে—'!

মাথা নাড়ে আসানী, 'না—না, মা বকবে! বাবা দেখতে পেলেন রক্ষা থাকবে না।

কাঙাল একটা ফুলকপি আর গোটা চারেক মূলো তুলে আনে মাঠ থেকে। দাওয়ায় নামিয়ে রেখে বউকে হাঁকে, 'কোতা গেলি—এই নে রাঁদ—আজ এক তরকারী ভাত। বাপরে বাপ, শক্তি ডাওর বটে'!

খেকিয়ে ওঠে বউ, 'ঘরে জল পড়চে! রান্নাঘরের ও পাশটায় দে'য়াল নেই ভাদর মাসের ডাওরে পড়ে গেলো—তোলার নাম করবেন না—'হু—হু করে উতুরে বাতাস—রাঁদবো ক্যামন করে শুনি'? পারব না—আমি পারব না পিণ্ডি সিজোতে—'!

মোলয়েম কণ্ঠে জবাব দেয় কাঙাল, ছিঃ—ওসব কথা বলতে নাই, ঘরামির ঘর এমনিই হয়রে বউ—!

একটু পর পণখানেক খড়ের একটা বাঙিল বেঁধে ফাঁকা জায়গাটা আড়াল দেয় কাঙাল। —'এবার হোয়েচে তো'?

'না'। মুখ ভেংচে বউ বলে, 'মুরোদ ঢাকা আছে! যাও—এবার তেল, মুন, এনে দাও দিকি দোকান থেকে'!

'এ্যাই এ্যাই মরেচে! —এ কোথাটা বলবে না?'

'না—না—না। —কাল থেকে বলচি, তেল—মুন বাড়ন্তু—'! 'হু', কে কার কথা শোনে'!

কাঙাল ঘরে ঢোকে!

মা ঘর থেকে হাঁক দেয়, 'নে বউ সকাল সকাল রাঁদ। নিকম্মা হয়ে বসে থাকলে খিদে বাড়ে, —একমুঠো খেয়ে শোবো'!

ব্যঙ্গ কণ্ঠে বউমা গেয়ে ওঠে, 'চঃ—কি আমার কাজুন্টি—অন্তদিন যেন দশ হাতে কাজ করে। ডাওর—দুখ্যোগ বোঝেনা গো মান্‌সটা—হঃ—'

'খবরদার—ওকে খুঁতাক খুঁতাক করিস না—বুড়ি মানুষ, হ্যা'।

‘এসনয় সবাই মিলে ঘ্যানর ঘ্যানর করলে মাতার ঠিক থাকে ? তুমিই বলো ? —ওগো তোমার পায়ে মাথা ঠুকটি, দোকানে যাও শীঘ্রি করে !’

এক খাঁচি ধান নিয়ে কাঙাল ঘর থেকে বেড়িয়ে—দোকানের পথ ধরে। মায়ের নজর এড়ায় না। টোকা মাথায় শতছিন্ন গেঞ্জি গায়ে চড়িয়ে তার উপর আধভেজা গামছাখানা জড়িয়ে উঠোন পেরোয় সে। বুক চড়চড়িয়ে ওঠে। কত সময় বলেও ছে, ‘ভোর রাতে মাঠে যাসু—যে ঠাণ্ডা, কস্থলখানা গায়ে দিলে—’

হাঁ—হাঁ করে ওঠে কাঙাল, ‘লোকে বলবে কি ? আমার গেঞ্জি গামছা বেঁচে থাক। —তাছাড়া একটু বেলা হলেই তো মাঠে রোদের ছড়াছড়ি গো মা, দিব্যি গা তেতে ওঠে।’

মনের কথা মনেই টগকা করে। বিছানার সামনা সামনি বসলে কস্থলটা ছেঁড়া তলাই থেকে উকি দেয়। পেছন ফিরে বিড়বিড় করে বকে। ‘শতুর—শতুর—’।

আসানী শুয়ে শুয়ে কাঁপছিলো। বিছানা খুলে কস্থলখানা এনে তার গায়ে জড়িয়ে দেয়, ‘বড্ড কাঁপচিসু—নে গায়ে জড়া—মা বাবা কিছু বলবেনা’ !

চীংকার করে ওঠে—আসানী, ‘না—না—ওমা, —জাকো ঠা’মা কি করে’ !

বোঁমা বুঝতে পারেনা ওদের কথা। উঠে আসে ঘরের ভেতর, ‘বঁাদা বাড়ার সময় জলাসু না বাপু—কি বলবি বল তাড়াতাড়ি—’ !

আসানীর মুখে হাত চাপা দেয় ঠা’মা। প্রফুল্ল কণ্ঠে বলে, বলছিলাম কি বোঁমা, তুমি বাইরে ঠাণ্ডায় বসে কাঁপচো—কস্থলটা গায়ে জড়াও। হ্যাঁ আরাম পাবে !

শোনবামাত্র নীচের পাটি ঠোঁট উন্টে যায় বোঁমার। ‘মরণ ! —তা হলে হোয়েচে ! —খিটকালে বাকী থাকবে’ ? বলেই আপনকাছে চলে যায় সে।

খিলখিল করে হাসে আসানী, ‘হোয়েচে’ ?

প্রচণ্ড বেগে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে কাঙালের মা।

হঠাৎ মনে আসে, ‘দূর ছাই, ঐ তো ওপাশে বুড়ী গাইটা ঠকঠক করে কাঁপচে, তার গায়ে কস্থলটা চাপিয়ে দিলে কেমন হয় ? হায় হায়, গায়ে এক ‘খি’ লোম নাই যে শীত রুখবে’ ? পরক্ষণে গুমরে গুমরে হেসে ওঠে, ‘লোক হাসানো কাজ হবে, কাঙালকে ছুঁবে ! —কি এমন ‘লবাব’ হোয়েচিসুরে—গাইটার গায়ে কস্থল চাপিয়েচিসু ! বটেই তো মা মরুক, ওটা বাঁচুক—বেচলে শ’ ছুয়েক আসবে কিনা’ !

\* • • • • \*

সন্ধ্যার দিকে শৈত্যপ্রবাহ বেড়ে যায়।

ছপুর্বে ভাত খেয়ে কাঙালের মা সেই যে ঘরের এক কোণে ছেঁড়া কাঁথা গায়ে জড়িয়ে গুটিগুটি মেরে শুয়েছে, নড়নাড়ন নাই।

আসানী মাঝে মাঝে দেখে ঠা'মা ভেগেছে কিনা।

কাঙাল বাধা দেয়, 'ঘুমুক ! আর কত বক্বক, করবে তোর সঙ্গে ? আলুনি ধরেচে, শুনচিস না, নাক ডাকচে' ?

চুপিচুপি কন্বলখানা ছ'ভাঁজ করে মায়ের গায়ে চাপিয়ে দেয় কাঙাল, 'কাঁপচে শীতে তবু গায়ে দিতে চায় না। — কি যে মানুষ'।

ভোরের দিকে প্রবল বৃষ্টি। শীতকালে এত বৃষ্টি ভাবা যায় না। মাঠের আলু, সরশে, ঘব সব শেষ হয়ে যাবে। ...কাঙাল বাইরে এসে আকাশের দিকে তাকায়। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ঘনঘন মেঘ ডাকছে।

তারপর চিমনি হাতে মায়ের ঘরে ঢোকে ? জল গড়িয়ে চৌকাঠে ঠেকেছে। সকাল হলে যে করে হোক কোনাটায় ক' আটি খড় চাপাতেই হবে'।

'একি ! মা ঘুমুচ্ছে অঘোরে তবু কন্বলখানা ছ-পা দিয়ে ঠানছে ক্যানে' ?

অনুমান ভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর মুহূর্তে পেয়ে যায় সে, হয়তো এ সংসারে বউ হয়ে আসার পর থেকে আজীবন দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রামের ক্ষোভ ও ঘৃণার প্রতিবাদ, এভাবেই পায়ের তলায় মর্মান্তিক ভাবে ফুটে উঠেছে। 'হায়রে অদৃষ্ট ! হায় ভগবান' ! — বিচিত্র মানব মন !

রেজিস্ট্রেশন অব বিউজাপপার (সেন্ট্রাল) ক্লসস, ১৯৬৬  
অনুযায়ী ৪ নং ফর্মের বিবরণ :

## আভা

প্রকাশ স্থান—কলিকাতা

প্রকাশের সময়—মাসিক

মুদ্রাকর / প্রকাশক / সম্পাদিকা— রেখা চট্টোপাধ্যায়। জাতি—ভারতীয়।

ঠিকানা—৭৩সি, শরৎ বসু রোড, কলিকাতা-৭০০ ০২৬

আমি রেখা চট্টোপাধ্যায় এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

স্বাক্ষর—

২৬।২।২৫

রেখা চট্টোপাধ্যায়

আভা / চৈত্র সংখ্যা—১৩

# স্মরণীয় পালা

## রীণা ভট্টাচার্য

**শুরু :**

১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে। ছেচল্লিশের দাঙ্গার পরে এক যুগ কেটে গেলেও দাঙ্গার আসান ঘটে নি। আসাম ধীরে ধীরে অগ্রগর্ত হয়ে উঠছে। হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট প্রচলিত হয়েছে। দুটো সাধারণ নির্বাচন শেষ হয়েছে। কমিউনিষ্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলেও কমিউনিষ্ট দলন অব্যাহত রয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে স্তালিন যুগ শেষ হয়ে ক্রুশ্চেভ জমানা চলছে। এই পটভূমিতে রচিত ও অভিনীত হয়েছিল রাজা দেবিদাস পালা। বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিল রাজা দেবিদাস। আজও সেই জনপ্রিয়তায় ভাঁটা পড়ে নি। চল্লিশ দশক থেকে অসংখ্য ঐতিহাসিক পালা অভিনীত হয়েছে যাত্রার আসরে। রাজা দেবিদাসও ঐতিহাসিক পালা। কিন্তু কেন রচনার পঁচিশ বছর পরেও পালাটি জনপ্রিয়তা হারায় নি?

**পালাকাহিনী :**

রাজা দেবিদাস পালার কাহিনীতে ইতিহাস অতি সামান্য। সোলেমান কররানী তাণ্ডায় রাজধানী স্থাপন করে বাংলা-বিহার উড়িষ্যার নবাবী শুরু করে। ভূঁইয়া রাজা দেবিদাস তার বশ্যতা স্বীকার না করলে নবাব দেবিদাসের রাজধানী ছাতক আক্রমণ করে। যুদ্ধে দেবিদাস প্রায় সবংশে নিহত হয়। এই ক্ষুদ্র আধারে গড়ে উঠেছিল বলিষ্ঠ বক্তব্যের পালা। দেবিদাসের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠায় নবাব। দেবিদাসের সেনাপতি ইসলাম খাঁ ছাতকের সৈন্যদের সংগঠিত করে, বালক বাহিনী তৈরী করে। তার স্ত্রী সোফিয়া গড়ে তোলে নারীবাহিনী। নদীপথে শত্রু-সৈন্যকে দেখেই জঙ্গলের আড়ালে লুকিয়ে থাকা নারীবাহিনী গুলি চালায়। অতর্কিত আক্রমণে অধিকাংশ নবাবী সৈন্য নিহত হয়। এর পরে স্থলে তাদের ধ্বংস করে ইসলাম খাঁ। এর মাঝে কিছু মুসলমান প্রজা দেবিদাসের বিরোধিতা করলে ইসলামের নেতৃত্বে বালকবাহিনী তাদের শেষ করে। এবার নবাব অন্য উপায় বার করে। ভূবণার রাজা শিখিধ্বজ আগেই নবাবের বশ্যতা স্বীকার করেছিল। তার জামাই ছিল দেবিদাসের ছেলে কেশব। নবাবের প্ররোচনায় কেশব, শিখিধ্বজ আর নবাবের অনুচর উলুক খাঁ ইসলামের স্ত্রী সোফিয়াকে চুরি করে। তারপর সেই অপরাধে দোষী বলে ধরিয়ে দেয় দেবিদাসের বড় ছেলে বীর যোদ্ধা কার্তিককে। পরে কার্তিককে গুপ্তহত্যা করে উলুক। ছেলের শোকে দেবিদাস আর স্ত্রীর শোকে ইসলাম শক্তিহীন হয় এবং দুজনেই নিহত হয়। ছাতক নবাবের অধিকারে আসে।

## সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে :

দেবিদাস কেন সোলেমানের অধীনতা স্বীকার করল না? গোড় দখলের সময়ে নৃশংস হত্যাকাণ্ড এবং নারী নির্যাতন করেছিল নবাব। দেবিদাস এ কারণেই সর্বশক্তি দিয়ে সোলেমানকে প্রতিহত করতে চান। এ কাজে একসঙ্গে মিলিত হয় ব্রাহ্মণ কার্তিক, তপাকথিত নিম্ববর্ণ মোহন মাল এবং মুসলমান ইসলাম খাঁ। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে শুধু পুরুষেরাও নয়, নারীরাও সামিল হয়। দেবিদাস নিহত হলে নাপিত ভোলানাথ তার তিন ছেলেকে রাজপুত্র সাজিয়ে ধরিয়ে দেয়। তাদের হত্যা করা হলেও তিনজন রাজপুত্র বেঁচে যায়। সোফিয়াকে চুরি করে নিয়ে যাবার সময়ে বাধা দিতে গিয়ে আহত হয় ভোলানাথের ছেলে পদ্মলোচন। সোফিয়াকে উদ্ধার করতে এগিয়ে যায় ভোলানাথের স্ত্রী বর্ষীয়সী দিগম্বরী। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দল-ধর্ম নির্বিশেষে একত্রিত হওয়া—এটা সেই সময়ে বিশেষ প্রয়োজন ছিল, এখনও আছে। কারণ সে সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন হলেও, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পৃথিবীতে জেঁকে বসেছে। এরই সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের চরিত্র বদল হয়ে আগ্রাসী মনোভাব ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে আসছে। গোটা বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ ধীরে ধীরে জোরালো প্রতিবাদ জানাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে।

## সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ :

সাম্রাজ্যবাদী পক্ষের স্বরূপ রাজা দেবিদাস পালায় পরিষ্কার হয়েছে। যে নবাব ইসলামের প্রসারের কথা মুখে ঘোষণা করে সেই নবাবই সোফিয়াকে—

এক, অপহরণ করিয়ে নিয়ে আসে এবং

দুই, ইসলাম বেঁচে আছে এবং তালাক দেয় নি জেনেও সোফিয়াকে আবার বিয়ে করতে বলে। শিখিধ্বজ রায় ব্রাহ্মণ, কেশব দেবরের সম্মানে প্রতিষ্ঠিত থেকেও মুসলমানী সোফিয়াকে চুরি করে উলুক খাঁর নৌকায় তুলে দেয়। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের অভিমান এখানে স্বার্থের আঘাতে চূর্ণ হয়েছে। এই ঘটনা প্রমাণ করেছে যে, দুর্জনের কোন ধর্ম বর্ণ নেই। যার ফলে কেশব রায় নির্দিষ্ট ধর্মত্যাগ করে রাজা হয়েছে। এখানে পালাকার সম্ভবত সেদিনের বিশ্বের বিভিন্ন চরিত্রের সাম্রাজ্যবাদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে খানিকটা সচেতন করতে চেয়েছিলেন।

## সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি :

ইসলাম খাঁ ছিল দেবিদাসের সবচেয়ে বড় সহায়। প্রথম যুদ্ধে নবাবের পরাজয়ের পেছনে ইসলাম খাঁ আর তার স্ত্রী সোফিয়ার অবদান ছিল অনেকখানি। নবাবের কাছ থেকে লোভনীয় চাকরির ডাক আসে শিখিধ্বজ রায় মারফৎ। ইসলামকে নবাবের সঙ্গে ধর্মের মিল জানিয়ে তার সৈন্যদলে যোগ দিতে বললে ইসলাম রাজী হয় না। সোফিয়া উত্তর দেয়, “আমরা আগে বাঙালী

হয়ে জন্মেছি, তারপর হয়েছি মুসলমান।” ধর্মকে জাতীয়তার নীচে স্থান দেওয়া পালাকারের চাঁদের মেয়ে, বাঙালী, ধর্মের বলির মতই এ পালায় ঝুঁকল পেয়েছে।

একই সঙ্গে ভোলানাথের গোটা পরিবারকে মহত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন পালাকার। কেশব শিখিধ্বজের মত ব্রাহ্মণের পাশে নাপিত ভোলানাথের স্ত্রীর সোফিয়া উদ্ধারে আত্মত্যাগ, পদ্মলোচনের সোফিয়া-ইসলামের জন্তু জীবন বিপন্ন করা, রাজপুত্রদের প্রাণরক্ষার জন্তু ভোলানাথের তিন ছেলের ক্ষেচ্ছামৃত্যু শ্রোতার মনে জন্ম দিত নবাব পক্ষের জন্তু ঘৃণা এবং ভোলানাথ পরিবারের জন্তু শ্রদ্ধা।

সোফিয়া অপহরণের পরে দেবিনাসকে দেখা গেছে আর্তনাদ করে উঠতে ; সর্বজয়াকে ছেলেদের উদ্দেশ্যে বলতে শোনা গেছে—“সবাই বলে আমি রত্নগর্ভা। আজ আমি তার প্রমাণ চাই। এই ভুঁইফোড়কে বুঝিয়ে দাও, যে ছাতকের মেয়ের গায়ে হাত তুললে মাথা দিবে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।” ঐ সময়ে দেবিনাস আর সর্বজয়ার মনে জাগ্রত ছিল সোফিয়ার জন্তু সম্মানস্নেহ। যাত্রা শুনতে শুনতে শ্রোতার মুগ্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়ে দেখতেন—

এক, মুসলমানীর জন্তু হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত বেদনা ;

দুই, হিন্দু মুসলমানের যৌথ উদ্যোগে মুসলমানী অপহরণ। শ্রোতার যাত্রা শুনতে শুনতেই স্পষ্টভাবে মানুষকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করে ফেলতেন : সজ্জন আর দুর্জন।

সাধারণতঃ ভারতীয়দের পালায় দেখা যেত মুসলমান কর্তৃক হিন্দু নারীর অপহরণ। রাজা দেবিনাস রচনার আগে যে সব দাঙ্গা হয়েছে তার সমকালে এবং পরে ভারতে হিন্দুনারী অপহরণের ঘটনাই বেশী তুলে ধরা হতো। পালাকার সেই ধারার বিরুদ্ধে গিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। যতদূর জানা যায় রাজা দেবিনাস পালাভিনয়ের প্রথম দিকে কোন কোন রক্ষণশীল মানুষ পালাকারকে দুটি ব্যাপারে প্রতিবাদ জানিয়েছেন—কেশবের ধর্মান্তর গ্রহণ এবং হিন্দুর সাহায্যে সোফিয়ার অপহরণ। কিন্তু পালাটির অভিনয় অত্যন্ত জনপ্রিয় হওয়ায় সেই প্রতিবাদ চাপা পড়ে যায়।

### বিবাহিণী :

সোফিয়া আর অঞ্জনা চরিত্র দুটির মধ্য দিয়ে পালাকার নারীমুক্তির বাণী শুনিয়েছেন। তিনি দেখেছিলেন হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট প্রবর্তিত হয়েও সমাজে নারীর অবস্থানের বিন্দুমাত্র পরিবর্তনও হয়নি। কাগজে কলমে সমানাধিকার স্বীকৃত হলেও সমাজের কোন ক্ষেত্রেই নারীরা তখনও যথেষ্ট এগিয়ে আসতে পারেন নি। বিয়ের ক্ষেত্রে নারীর মত তখনও প্রায় অগ্রাহ্য (সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া) হত।

অঞ্জনা দেবিনাসের ছেলে কেশবের স্ত্রী। বেইমান দয়িতের জন্তু সবসময়েই সে মরমে মরে থাকে। তার ছেলে শিখিধ্বজের কাছে মানুষ হচ্ছিল। শিখিধ্বজের বশুতা স্বীকারের পরে সে তাকে নিয়ে আসে, কারণ সে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে—“পরোধীন ভূষণার রাজা হওয়ার চেয়ে স্বাধীন ছাতকের গাড়োয়ান হওয়াও ভাল।” কেশব রাজ্যলোভে নবাবের সঙ্গে যোগ

দেওয়ায় অঙ্গনা তাকে পরিত্যাগ করে। কেশরের চোখের সামনেই শাখা ভেঙে ফেলে, সিঁদুর মুছে ফেলে। এরই পাশাপাশি সোফিয়ার মধ্যে দেখা যায় দেশপ্রেমিক সং দয়িতের প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম। প্রবল প্রতাপ নবাবের সামনে দাঁড়িয়ে সোফিয়া মাথা উঁচু করে যখন বলত, ‘আমার দেহটাকে তোমরা হারেমে বেঁধে রাখতে পার, কিন্তু আমার মনটা বাঁধা আছে একজনেরই সাথে। ছুনিয়ায় এমন কোন সম্পদ নেই যা পেয়ে আমি আমার সে গরীব খসমকে ভুলে যেতে পারি।’ দুটি মুহূর্তই আজও অনেক শ্রোতার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে শ্রোতার হর্ষধ্বনি শোনা যেত “একটি বিশেষ গানে—

“বাংলার জননীরা ওঠ, জেগে ওঠ,  
পুরুষের পাশে ছোট তবে ছোট।”

### আঞ্চলিকতার বিরোধিতা :

বাংলার নবাব সোলেমান আফগানিস্তান থেকে এদেশে এসে রাজ্য দখল করেও কোন সময়েই নিজেকে বাঙালী বা ভারতীয় বলে ভাবতে পারে না। এর ফলে বাঙালী বা ভারতীয়ের উপর অত্যাচার করতে তার দ্বিধা হয় না। এর পাশাপাশি পালাকার সৃষ্টি করেছেন দায়ুদ খাঁর চরিত্র। সোলেমানের ছেলে হয়েও সে নিজেকে বাঙালী বলে ভাবে। স্বভাবতই এদেশের মানুষের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদ না করে সে পারে না।

ব্রজেন্দ্রকুমারের বহু পালাই আসাম অঞ্চলে অভিনীত হত পূর্ব আর পশ্চিমবঙ্গের যাত্রা দলের দ্বারা। তাঁর বিচারক পালা থেকে আসামের যাত্রা দল তাঁর পালা অসমীয়া ভাষায় অনুবাদ করে অভিনয় করা শুরু করে। ফলত আসামের জনসাধারণের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। বাংলাভাষী বহু মানুষ আসামে পুরুষানুক্রমে বাস করেও নিজেদের অসমীয়াদের সঙ্গে মিশিয়ে নিতে পারেন নি—সম্ভবত এ দিকটি তাঁর নজর এড়ায় নি। আবার এই বঙ্গের শিল্পাঞ্চলে উত্তর-প্রদেশ আর বিহার থেকে আসা শ্রমিকদের সঙ্গেও বাঙালীদের আত্মিক যোগাযোগ ক্ষীণ ছিল। এরই ফলে তিনি দায়ুদ জাতীয় চরিত্রের মাধ্যমে আঞ্চলিকতার বিরোধিতা করেছেন। তাঁর পরামর্শ ছিল যেখানে বাস করবে মানুষ তাকেই মাতৃভূমি বলে মেনে নিয়ে সেখানকার মানুষের সঙ্গে মিশে যাক।

### উপসংহার :

নারীমুক্তি আজও ধীর গতিতে এগোচ্ছে, প্রাদেশিকতায় গোটা ভারতবর্ষ আচ্ছন্ন, বাবরি মসজিদের কলঙ্ক প্রমাণ করেছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আমাদের মনে স্থান পায় নি, সাম্রাজ্যবাদ নানাভাবে আমাদের গলা টিপে ধরেছে। এ কারণেই আজ রচনার পর্যটন বহুর পেরিয়ে এসেও এ পালার সংস্করণ হয়। আজও পালাটি প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকে।

## ফুল

### কুম্ভার রঞ্জন

কচি কচি ডালে হরিৎ লহিতে জন্ম আমার,  
ত্রিলোকে ফুটোয়েছি আমার রূপের বাহার।  
নানা রঙের রূপসী আমি, নানা গন্ধে সুবাসী।  
প্রিয়ার চোখে সুকতারা সম চিরদিন ভাসী।  
নেই মোর আপন জন, তবু নাহি কারো পর।  
যেথা পাই ঠাই সেথাই বাঁধি রূপের ঘর।  
আমি পারি না বুঝতে উদাসীর মন ব্যাথা।  
শুধু দিয়ে যাই সবারে ভালোবাসার আশা।  
আসি আধারী রাতে কুবতারার মতো,  
মিট মিট করে জ্বালি শান্তির আলো।  
তোমরা হয়ত ভাব মনে মনে,  
রূপ আছে বলে আমার চিন্তা নেই প্রাণে।  
আমি ভাবি, যখন তোমরা ঘুমিয়ে থাক,  
ডাকি ভগবানে, আর বলি বিশ্ব বাঁচিয়ে রাখ।  
পৃথিবীটা ধ্বংস হলে আমি কি থাকবো বেলো?  
মানুষ যদি না থাকে আমার সৌন্দর্য কি রইল।  
আমি যদি না থাকি তোমার পূজায় হবে বন্ধ।  
ধ্বংস চোখে দেখতে গেলে শেষে নিজেই হবে অন্ধ।  
ফুল হয়ে আমি মিনতী জানাই হে ত্রিলক মহিমাণ,  
মাটির পৃথিবীকে তুমি রাখ ভগবান।

একটি ব্যতিক্রমী সাহিত্য পত্রিকা—নির্ভিক সমালোচনা ও বিতর্কিত লেখায় ভরা

## “সত্যদর্শন”

আপনার কপির জন্য আজই ১০ টাকা পাঠিয়ে গ্রাহক হোন।

যোগাযোগ :—**ঘণিষকর পুরকায়স্থ** সম্পাদক, সত্যদর্শন,

ডাক—বিহাড়া, কাছাড়, অসম পিন—৭৮৮৮১৭

## চিঠিগত

মাননীয় সম্পাদিকা  
আভা মাসিক পত্রিকা  
কলিকাতা-২৬

মহাশয়া, আপনাদের বহুল প্রচারিত মাসিক আভা পত্রিকায় নিম্নোলিখিত চিঠিটা প্রকাশ  
করিয়া বাধিত করিবেন।

নমস্কারান্তে—ইতি—

অসিত কুমার সাহা  
১৯, শম্ভুনাথ দাস লেন,  
কলিকাতা-৫০  
২৪. ৪. ২৫

আপনাদের “তাপস—তপস্শায় মগ্ন এক ব্যক্তির” লেখক শ্রীসত্যসেবক সরস্বতীকে আন্তরিক অভিনন্দন  
জানাই। তবে লেখা পড়ে আমাদের সব সাধ পূর্ণ হলো না। আমরা আরও কিছু বিস্তারিত  
জ্ঞাতব্য তথ্য সংযোগ করতে চাই। যার ফলে বিনয়বাবুর সবদিক সকলে জানতে পারবেন।

এখন উনি পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের উন্নতির ব্যাপারে নানান কাজকর্ম নিরবে এখনও  
করে চলেছেন।

সম্প্রতি শারীরিক অসুস্থতার জন্য শরীর ও মন খুব ভেঙ্গে পড়েছে। তা সত্ত্বেও বর্তমানে  
তিনি পথ শিশুদের নিয়ে দেক্ভাল করছেন—রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশনের তরফ থেকে। ভারতীয়  
সংস্কৃতি ভবন ও বাংলা সাহিত্য একাডেমীর কাজ সমান তালে এগিয়ে চলেছে—শ্রামবাজারের  
১৩১এ, বিধান সরণি থেকে।

স্ট্রোকে অঙ্গহানী না হলেও, এই অবস্থায় দিনে তিনিই পথ দেখান নানান প্রতিষ্ঠানকে,  
নানান মানুষকে, যেই তার কাছে কোন রকম সবযোগিতা চান। তাকেই তিনি আপন করে  
সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। আতিথেয়তার গতি এখনও সমান তালেই চলেছে।

এ ছাড়াও বহু অপ্রকাশিত মূল্যবান চিঠি, বহু মূল্যবান প্রশংসাপত্র বিবিধ চিঠিপত্র, ছবি  
প্রভৃতি আছে যনি প্রয়োজন হয় বলবেন আমরা আপনাদের সাহায্য করতে পারবো।

আভা / চৈত্র সংখ্যা—১৯

## সম্পাদিকার কথা—



নান'রকম ঝড় ঝাপটা কাটিয়ে “আভা” পত্রিকার নতুন বছর শুরু হল। প্রকাশের কিছুটা দেরীর জন্য সকলের কাছে মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি। আশাকরি পত্রিকার সকল সুহৃদ ও বন্ধুরা পূর্বের স্থায় সহযোগিতার হাত নিশ্চই বাড়িয়ে দেবেন। সেই সঙ্গে ভগবানের চরণে প্রণতি জানাই কারণ একমাত্র তাঁর আশীর্বাদেই পত্রিকা এখন পর্যন্ত জীবিত আছে।

প্রচণ্ড দাবদাহে সমস্ত দেশ জ্বলছে। মাঝে মাঝে আকাশে মেঘের সঞ্চার দেখে বর্ষণের আশা কিন্তু ফলবতি হচ্ছে না। সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে চলেছে

নিরপরাধ জনগণকে হত্যার প্রবাহ সঙ্গে নারী জাতির প্রতি অত্যাচার অবিচার অব্যাহত। গ্রামে গঞ্জে শহরে কোথাও আজ মানুষ নিরাপদে বসবাস করতে পারছে না। প্রকাশ্য দিবালোকে দিনের পর দিন পথে ঘাটে তো বটেই এমন কি বাড়ীর অভ্যন্তরেও আজ মানুষ নিরাপদ নয়। একজনের বিপদে আজ কেউ রক্ষা করতে আসে না। প্রশাসন নীরব। বড় বড় ঘটনায় কমিশন বসান হয় কিন্তু দীর্ঘদিন অপেক্ষা করেও তার ফলাফল জানা যায় না। দীর্ঘদিন ধরে আত্মজন নীরবে অশ্রু বিসর্জন করে চলে। জনসাধারণ আবার নতুন ঘটনার খবরে পূর্বের ঘটনার কথা ভুলে যায় এছাড়া জলে স্থলে আকাশে নানা ধরনের দুর্ঘটনায় কত মানুষ পৃথিবীর বুকে থেকে চিরদিনের জন্য মুছে যাচ্ছে। তবু মানুষ বেঁচে থাকার তাগিদে নিত্যনৈমিত্তিক কাজ করে যায়—ছুখে কান্দে আবার সব কিছু ভুলে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখবার তাগিদে হাসে এবং আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠে। বিগতকে ভুলে তাই আগতের সন্ধানে তার নিত্য যাত্রা। মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকাই জীবনের লক্ষণ।

# — নিঃ

## লেখক

- ১। 'আভা'তে প্রকাশের জন্য সমস্ত রচনা নকল রে।
- ২। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে উত্তম পৃষ্ঠায় লিখিত :
- ৩। বাংলা যাদের মাতৃভাষা নয় এমন লেখক বা লো।
- ৪। জাতীয় সংহতির পরিপ্রেক্ষিতে রচিত যে কোন রচনা।
- ৫। নূতন লেখক-লেখিকার প্রকাশযোগ্য রচনা যথাসময়ে প্র।
- ৬। মিল ও ছন্দোবদ্ধ কবিতাকে সুযোগ দেওয়া হবে।
- ৭। অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।
- ৮। উপযুক্ত ডাক টিকিট সঙ্গে না থাকলে কোন পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

## গ্রাহকদের প্রতি

- ১। গ্রাহকদের এক বৎসরের টাঁদা সভাক ২১ টাকা। আজীবন গ্রাহক টাঁদা সভাক ১৫০ টাকা।
- ২। যে কোন মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।
- ৩। ভি. পিতে পত্রিকা পাঠানো সম্ভব নয়। গ্রাহকদের টাঁদা যদি অর্ডার যোগে 'আভা' কার্যালয়ে পাঠাতে হবে।

## আভা পত্রিকা কর্তৃক প্রকাশিত বিশেষ বিশেষ সংখ্যা গ্রন্থ-গঞ্জীসহ

ছাত্র-ছাত্রীদের ও বাংলা ভাষার গবেষকদের সহায়ক।

মূল্য টাকা

মূল্য টাকা

|                                          |      |                                     |       |
|------------------------------------------|------|-------------------------------------|-------|
| ১২৭ শত-বার্ষিকী সংখ্যা (দ্বিতীয় পর্ব)   |      | আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার সংখ্যা    | ৪.৫০  |
| ভাষাস্তরে শরৎ সাহিত্য সহ                 | ৯.০০ | প্রেমেন্দ্র মিত্র সংখ্যা            | ১১.০০ |
| সুজল স্মরণ সংখ্যা                        | ০.০০ | হীরেন বসু সংখ্যা                    | ৭.৫০  |
| ডাঃ কীলীকির সেনগুপ্ত সংখ্যা              | ২.০০ | আশাপূর্ণা দেবী সংখ্যা               | ১৫.৪০ |
| আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় সংখ্যা | ৭.৫০ | শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব সংখ্যা (নিঃশেষিত) | ৭.৫০  |
| ভাষাবিদ হরিনাথ দে ৩য় শতবর্ষ সংখ্যা      | ৪.৫০ | "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব" সংখ্যা        | ১২.০০ |
| সুজল স্মরণ সংখ্যা                        | ৪.৫০ | অজিত কৃষ্ণ বসু (অ. কৃ. ব.) সংখ্যা   | ১২.০০ |
| বিমল মোহন বাগচী জন্ম শতবর্ষ সংখ্যা       | ৬.০০ | শ্রীঅরবিন্দ সংখ্যা                  | ৬.০০  |
| বনফুল শ্রদ্ধার্থ সংখ্যা                  | ৬.০০ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সংখ্যা  | ৯.০০  |

"দাদামশাই" কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা ১১.০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান : "আভা" কার্যালয়, ৭৩সি, শরৎ বসু রোড, কলিকাতা-৭০০ ০২৬

**ABHA**

Regd. No. WB,  
R. N. 18638/72

March—1995

## সু-সাহিত্যিক শোভনা সেন-এর

১/২ শ্রাম বোস রোড, চেল্লা, কলিকাতা-১৭

বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা মহিলাদের জন্মে, সম্ভবতঃ  
সর্ববিধ সুবিধাসহ থাকে-খাওয়ার ব্যবস্থা আছে।

পরিচালনায় :—

উদ্যমতপ, কো-অডিনেটিং কাউন্সিল

৫/১, বেডক্রস্ প্রেস, কলিকাতা-৭০০০০১

পুস্তকোত্তম শ্রীচৈতন্য

মূল্য ১০ টাকা

সাধক মালিকা

মূল্য ১০ টাকা

ছোটদের শ্রীরামকৃষ্ণ (পঞ্চ)

মূল্য ৫ টাকা

মাটির প্রদীপ (কাব্য গ্রন্থ)

মূল্য ৫ টাকা

এরা কাজ করে (গল্প)

মূল্য ১৫ টাকা

প্রাপ্তিস্থান : এম সি সরকার আণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ,  
১৪, বক্সিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

## গিরিবালা মহিলা নিবাস

ছাত্রী ও কর্মবতা মহিলাদের

আবাসিক ব্যবস্থা আছে।

ফোন : ৪৭৫-৮১৭২

## নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন

দক্ষিণ কলিকাতা শাখা

১১, পালিত স্ট্রীট, কলিকাতা-১৯

ইংরেজী মহিলাদের আইনগত সাহায্য এবং জীবনে  
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

To

Sri/Sm. The Librarian

Bengali Section

University of Calcutta

College Square

Calcutta - 12

প্রকাশক :—শ্রীমতী রেখা চট্টোপাধ্যায়, ৭৩সি, শরৎ বসু রোড, কলিকাতা-২৬।

:—কৃষ্ণা আর্ট প্রেস, ৩১, আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২০।

ফেরৎ পাঠাতে হলে প্রকাশকের ঠিকানায় পাঠাবেন।

